ছবি ৫.৯ :
মুঘল দরবারে বাদশাহ আকবর রাজপুত অভিজাতদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। ছবিটি *আকবরনামা* থেকে নেওয়া।

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে জাহাঙ্গির ও শাহ জাহান আকবরের রাজপুত নীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। জাহাঙ্গিরের আমলে মেওয়াড়ে মুঘলদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। রানা প্রতাপের ছেলে অমর সিংহ উঁচু মনসব পেয়েছিলেন। শাহজাহানের আমলে রাজপুত সর্দাররা দূর মধ্য এশিয়াতেও লড়াই করতে গিয়েছিল। এই আমলেও রাজপুতদের উঁচু পদ দেওয়া হতো।

ঔরঙ্গজেবের সময়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় রাজপুতরা মুঘল মনসবদারি ব্যবস্থার আওতায় এসেছিল। অম্বরের মির্জা রাজা জয়সিংহ ছিলেন ঔরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত অভিজাতদের মধ্যে একজন। মারওয়াড়ের রাঠোর রাজপুত রানা যশোবন্ত সিংহ প্রথমে বাদশাহের বিরোধী ছিলেন। তবে পরে তিনি মোটা রকমের মনসব পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার নিয়ে মারওয়াড়ের রাজধানী যোধপুরে গন্ডগোল শুরু হয়। মুঘলরা ওই রাজ্যটি পুরোপুরি হাতে নিয়ে নেয়। এর ফলে শুরু হয় রাঠোর যুদ্ধ (১৬৭৯ খ্রিঃ)। এই যুদ্ধে গোড়ার দিকে মেওয়াড় রাজ্য মারওয়াড়ের পক্ষে ছিল। রাঠোর যুদ্ধ মুঘলদের পক্ষে লাভজনক হয়নি। উপরন্তু, আকবর জিজিয়া কর তুলে নেওয়ার একশো বছর পরে ঔরঙ্গজেব আবার জিজিয়া কর চাপিয়েছিলেন (১৬৭৯ খ্রিঃ)। অর্থাৎ, আকবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘলদের রাজপুত নীতিতে অনেক মিল ছিল। আবার, কোনো কোনো দিকে অমিলও ছিল।

টুকরো কথা

মারওয়াড়

*রাজস্থানের ভাষায় '**ওয়াড়**' শব্দের মানে একটি বিশেষ অঞ্চল। মারওয়াড় শব্দটি এসেছে '**মরুওয়াড়**' (মরু অঞ্চল) কথাটি থেকে।*

৫.৩.২ মুঘল রাজশক্তি ও দাক্ষিণাত্য

বাহমনি রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পরে দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি সুলতানি রাজ্যের উত্থানের কথা আমরা আগেই পড়েছি। এ সব হলো মুঘলদের ভারতে আসার আগের ঘটনা। আকবরের শাসনকালের প্রথম দিকে যখন উত্তর ভারতে মুঘলরা ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠছে, দাক্ষিণাত্যে তখন সুলতানি রাজ্যগুলি একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করছে। মনে রেখো, বিজয়নগরের পরাজয়ের পরে সুলতানি রাজ্যগুলির সামনে রাজ্যবিস্তার করার অনেক সুযোগ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ওই সময় থেকে দাক্ষিণাত্যে বড়ো বড়ো জমির মালিক মারাঠা সর্দার ও সৈনিকরা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলিতে পুরোনো অভিজাত ও বাইরে থেকে আসা নতুন অভিজাতদের মধ্যে সম্পর্ক মোটেও ভালো ছিল না। এর মধ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে পোর্তুগিজরাও পা রেখেছিল।

এই অবস্থায় মুঘলরা দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বাড়াতে চাইল। দাক্ষিণাত্য ছিল দিল্লি-আগ্রা থেকে বহু দূরে। আকবরের ভেবেছিলেন যে দক্ষিণী রাজ্যগুলি অনেক রাজপুত রাজ্যের মতোই মুঘলদের বন্ধু হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ভাগে দক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি ছিল বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, আহমেদনগর, বেরার, বিদর ও খান্দেশ। ১৫৯৬ থেকে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুঘলরা বেরার, আহমেদনগর ও খান্দেশ জয় করে। খান্দেশের গুরুত্বপূর্ণ অসিরগড় দুর্গটিও মুঘলদের হাতে চলে আসে। আহমেদনগরের

প্রধানমন্ত্রী মালিক অম্বরের চেষ্টায় দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করে।

জাহাঙ্গির মারাঠা শক্তির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁদের দলে টানবার চেষ্টা করেন। আকবরের সময়ে দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের যা অবস্থা ছিল জাহাঙ্গির তাই বজায় রাখার চেষ্টা করেন। ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আহমেদনগর রাজ্যটি মুঘলদের দখলে আসে। ঐ বছরেই শাহজাহান বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সঙ্গে চুক্তি করে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। পরে মুঘলরাই এই চুক্তি ভেঙে দেয়। এর ফলে দাক্ষিণাত্যের শাসকরা মুঘলদের ওপর আস্থা হারান।

ছবি ৫.১০ :
মুঘল সৈন্য গোলকোন্ডার একটি দুর্গ আক্রমণ করছে (খ্রিস্টীয় ১৭শ শতক)। ছবিটি *পাদশাহনামা* থেকে নেওয়া

৫.৪, ৫.৭, ৫.৮ ও ৫.১০-এই চারটি ছবিতে কোন কোন অস্ত্র ও পশুকে যুদ্ধে ব্যবহার করতে দেখতে পাচ্ছো? এই ছবিগুলি থেকে মুঘলদের যুদ্ধ করার বিষয়ে কী কী জানা যাচ্ছে?

টুকরো কথা

দাক্ষিণাত্য ক্ষত

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে ঔরঙ্গজেবের সময়ে মারাঠাদের শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ঔরঙ্গজেব ভেবেছিলেন যে দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে জয় করতে পারলে সেখানে থেকে অনেক বেশি রাজস্ব আদায় করা যাবে। তার সঙ্গে মারাঠাদের দমন করাও সহজ হবে। ঔরঙ্গজেবের আমলে মুঘলরা বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা দখল করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন এত বড়ো আগে কখনো হয়নি। কিন্তু বাদশাহ যা ভেবেছিলেন তা হলো না। তার বদলে বহু বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুঘলদের অনেক আর্থিক ক্ষতি হলো। দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের এই ক্ষত আর সারলো না। মারাঠা নেতা শিবাজীকেও স্বাধীন রাজা বলে মেনে নিতে হলো। পঁচিশ বছর ধরে যুদ্ধ করে ঔরঙ্গজেব শেষে দাক্ষিণাত্যেই মারা গেলেন (১৭০৭ খ্রিঃ)।

মানচিত্র ৫.২ : মুঘল সাম্রাজ্য (আনুমানিক ১৭০০ খ্রিঃ)

৫.৪ বাদশাহি শাসন : প্রশাসনিক আদর্শ

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক আদর্শ ছিল মূলত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে একটি যথার্থই ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। আকবরের প্রশাসনিক আদর্শ তৈমুরীয়, পারসিক এবং ভারতীয় রাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ বলা চলে। এই আদর্শে বাদশাহ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন করবেন এবং প্রজাদের প্রতি তাঁর পিতৃসুলভ ভালোবাসা থাকবে। অর্থাৎ তাঁর শাসন করার অধিকার অন্য কোন শাসকের থেকে পাওয়া নয়। এই ক্ষমতা তাঁর নিজের। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত থাকবে না। সকলের প্রতি সহনশীলতা এবং সকলের জন্য শান্তির এই পথকেই বলা হয় '*সুলহ-ই কুল*'। এই আদর্শের ভিত্তিতে আকবর একটি ব্যক্তিগত মতাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন যাকে বলা হয় '*দীন-ই ইলাহি*'।

প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরের শাসনকাল যুদ্ধ বিগ্রহেই কেটেছিল। প্রশাসনের দিকে তিনি সেভাবে নজর দিতে পারেননি। মুঘল শাসনের মাঝে আফগান শাসক শেরশাহের প্রশাসনিক পরিকাঠামো সুপরিকল্পিত ছিল যা পরবর্তীকালে আকবর অনেকাংশে অনুসরণ করেছিলেন। আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। প্রদেশগুলিকে বলা হতো *সুবা*। সুবাগুলি আবার ভাগ করা হতো কয়েকটি *সরকারে* এবং সরকারগুলি ভাগ করা হতো *পরগনাতে*।

আকবর সামরিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করেন। সেটি ছিল তাঁর মনসবদারি ব্যবস্থা। আকবরের শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনিক পদগুলিকে বলা হতো মনসব। আর পদাধিকারীদের বলা হতো মনসবদার। মনসবদারদের কর্তব্য ছিল বাদশাহের জন্য সৈন্য প্রস্তুত রাখা, সৈন্যদের দেখাশোনা করা এবং যুদ্ধের সময় সৈন্য জোগান দেওয়া। পদ অনুসারে মনসবদারদের বিভিন্ন স্তর ছিল। সবচেয়ে উপরের পদগুলি কেবল রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য রাখা থাকত। উচ্চপদস্থ মনসবদারদের বলা হতো *আমির*। মনসবদারদের যুদ্ধের ঘোড়াগুলিকে পর্যবেক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে রাজধানীতে হাজির করতে হতো।

৫.১ ও ৫.২ মানচিত্র দুটির তুলনা করে বলো অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় কোন কোন অঞ্চল মুঘল শাসনের আওতায় এসেছিল ?

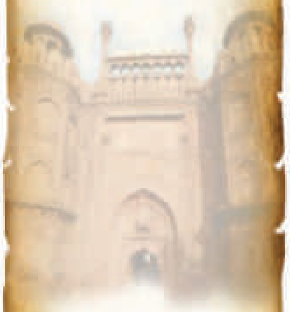

টুকরো কথা

মনসবদার ও জায়গির

- মনসবদারদের দু-ভাবে বেতন দেওয়া হতো — নগদে অথবা রাজস্ব বরাত দিয়ে। রাজস্বের এই বরাতকে বলা হতো জায়গির। জায়গির যিনি পেতেন তিনি জায়গিরদার। এই ব্যবস্থাকে বলা হতো জায়গিরদারি ব্যবস্থা। যে রাজস্ব আদায় করা হতো, তার এক অংশ দিয়ে জায়গিরদাররা নিজেদের ভরণপোষণ করত এবং ঘোড়সওয়ারদের দেখাশোনা করত। জায়গির মানে কিন্তু জমি নয়। চাষজমি, বন্দর এলাকা, বাজার এ সবের থেকেই রাজস্ব আদায়ের বরাত জায়গির হিসাবে দেওয়া হতো।
- মনসবদারদের বাদশাহ নিজেই নিয়োগ করতেন। তাদের পদোন্নতিও তাঁর উপরই নির্ভর করত।
- জায়গিরদারদের বদলি করা হতো।
- মনসবদারি ও জায়গিরদারি ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক ছিল না।

রাজস্ব ব্যবস্থা এবং জাবতি

ভারতবর্ষ ছিল কৃষিনির্ভর দেশ। তাই ভালভাবে শাসন পরিচালনা করতে হলে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন ছিল। আলাউদ্দিন খলজির আমল থেকেই রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য জমি জরিপ করার বা মাপার ব্যবস্থা ছিল। পরে শেরশাহের সময়ও জমি মাপা হয়। আকবর নতুন করে জমি জরিপ করান। জমি জরিপের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করার পদ্ধতিকে বলা হয় 'জাবতি'। 'জাবত' মানে নির্ধারণ। শেরশাহ বিভিন্ন শস্যের মূল্য অনুযায়ী একটি তালিকা তৈরি করিয়েছিলেন। আকবর দেখলেন যে এই তালিকার প্রধান সমস্যা হলো রাজধানীতে শস্যের মূল্যের সঙ্গে অন্যান্য জায়গার শস্যের মূল্য সব সময় মিলছে না। রাজধানীর শস্যমূল্য অন্যান্য জায়গার থেকে বেশি ছিল। রাজধানীর হিসাবে চললে কৃষকদের আরও বেশি রাজস্ব দিতে হতো। তাই আকবর প্রত্যেক বছরের এবং প্রতিটি এলাকার আলাদা হিসাব চালু করলেন। প্রত্যেক এলাকার উৎপাদন, বাজারে শস্যের মূল্য ইত্যাদি নানারকম তথ্য সরকারকে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল কানুনগোদের। রাজস্ব আদায় করত এবং কানুনগোদের তথ্য মিলিয়ে দিত যে সব কর্মচারী তাদের বলা হতো করোরী। আগের দশ বছরের তথ্যের ভিত্তিতে চালু এই ব্যবস্থাকে

বলা হয় 'দহসালা' ব্যবস্থা। 'দহ' মানে দশ। আকবর ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে দহসালা ব্যবস্থা চালু করেন। আকবরকে এই রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলন করতে সাহায্য করেছিলেন তাঁর রাজস্বমন্ত্রী রাজা টোডরমল এবং আরো কয়েকজন রাজকর্মচারী। টোডরমলের নাম থেকেই এই ব্যবস্থার নাম হয় টোডরমলের বন্দোবস্ত। অবশ্য মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র জাবতি ব্যবস্থা চালু ছিল না।

রাজস্ব যাঁরা আদায় করতেন, তাঁদের নির্দেশ দেওয়া থাকতো কৃষকদের অত্যাচার না করতে। সরকার দুঃসময়ে কৃষকদের ঋণ দিত। কখনো দরকারমতো রাজস্ব মকুবও করা হতো। আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্বার্থ যেমন দেখা হয়েছিল, কৃষকদের সুবিধার কথাও মাথায় রাখা হয়েছিল। তবে বিদ্রোহী কৃষককে রাষ্ট্র কঠোর সাজা দিত।

ছবি ৫.১১ :
অশ্বারোহী শাহজাহান (মূল রঙিন ছবিটি শিল্পী প্রয়াগের আঁকা)।

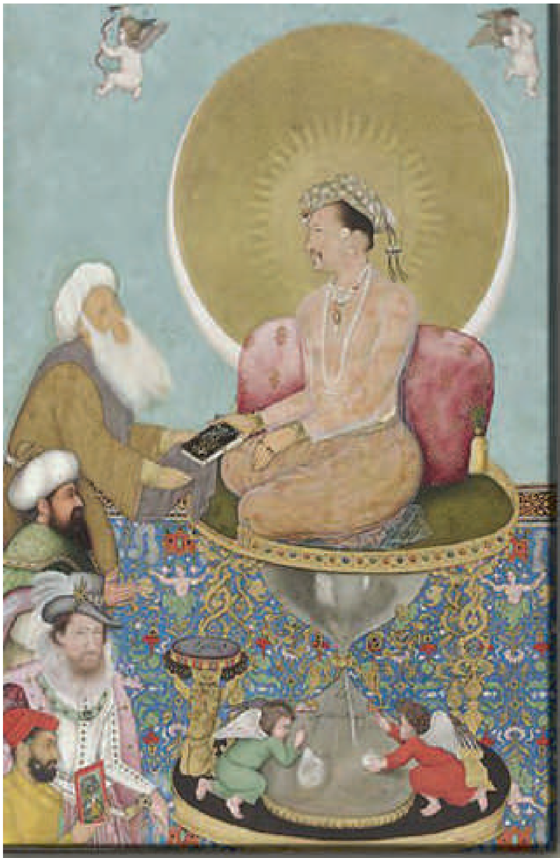

মুঘল কারখানায় শুধু বাদশাহের প্রতিকৃতিই আঁকা হতো না, পশু-পাখি এবং উদ্ভিদও আঁকা হতো। এই ছবিগুলি অনেক সময়ই কয়েকজন শিল্পী মিলে তৈরি করতেন। রঙের ব্যবহার আর সূক্ষ্ম কারুকার্যের দক্ষতা দেখা যায় ছবিগুলিতে। [(১) জাহাঙ্গির ও সুফি (শিল্পী : বিচিত্র), (২) চিনার গাছে কাঠবেড়ালি (শিল্পী : আবুল হাসান), (৩) নীলগাই এবং (৪) বহুরূপী (শিল্পী : মনসুর)]

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) ঘর্ঘরার যুদ্ধে বাবরের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ____________ (রানা সঙ্গ/ ইব্রাহিম লোদি/নসরৎ খান)।

(খ) বিলগ্রামের যুদ্ধ হয়েছিল ____________ (১৫৩৯/ ১৫৪০/ ১৫৪১) খ্রিস্টাব্দে।

(গ) জাহাঙ্গিরের আমলে শিখ গুরু ____________ (জয়সিংহ/ অর্জুন/ হিমু) কে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

(ঘ) রাজপুত নেতাদের মধ্যে মুঘল সম্রাটদের সঙ্গে জোট বাঁধেননি রানা ____________ (প্রতাপসিংহ / মানসিংহ/ যশোবন্ত সিংহ)।

(ঙ) আহমেদনগরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ____________ (টোডরমল/ মালিক অম্বর/ বৈরাম খান)।

২। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে তার নীচের কোন ব্যাখ্যাটি তোমার সবচেয়ে মানানসই বলে মনে হয়?

(ক) **বিবৃতি :** মুঘলরা তৈমুরের বংশধর হিসাবে গর্ব করত।

ব্যাখ্যা-১ : তৈমুর ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : তৈমুর এক সময় উত্তর ভারত আক্রমণ করে দিল্লি দখল করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তৈমুর ছিলেন একজন সফাবি শাসক।

(খ) **বিবৃতি :** হুমায়ুনকে এক সময় ভারত ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : তিনি নিজের ভাইদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : তিনি শের খানের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তিনি রানা সঙ্গের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

(গ) **বিবৃতি :** মহেশ দাসের নাম হয়েছিল বীরবল।

ব্যাখ্যা-১ : তাঁর গায়ে খুব জোর ছিল।

ব্যাখ্যা-২ : তিনি খুব বুদ্ধিমান ছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন।

(ঘ) **বিবৃতি :** ঔরঙ্গজেবের আমলে বাংলায় সামুদ্রিক বাণিজ্যের উন্নতি হয়।

ব্যাখ্যা-১ : তিনি পোর্তুগিজ জলদস্যুদের হারিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : তিনি শিবাজিকে পরাজিত করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তিনি বাংলায় বাণিজ্যের উপর কর ছাড় দিয়েছিলেন।

(ঙ) **বিবৃতি :** আকবরের আমলে জমি জরিপের পদ্ধতিকে বলা হতো জাবতি।

ব্যাখ্যা-১ : জাবত মানে বাজারে শস্যের দাম ঠিক করা।

ব্যাখ্যা-২ : জাবত মানে একমাত্র বাদশাহ কর আদায় করতে পারেন।

ব্যাখ্যা-৩ : জাবত মানে জমির রাজস্ব নির্ধারণ করা।

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) মুঘলরা কেন নিজেদের বাদশাহ বলতো?

(খ) হুমায়ুন আফগানদের কাছে কেন হেরে গিয়েছিলেন?

(গ) ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে কোনো মুঘল অভিজাতদের মধ্যে রেষারেষি বেড়েছিল?

(ঘ) সুলহ-ই কুল কী?

(ঙ) মুঘল শাসন ব্যবস্থায় সুবা প্রশাসনের পরিচয় দাও।

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) পানিপতের প্রথম যুদ্ধ, খানুয়ার যুদ্ধ ও ঘর্ঘরার যুদ্ধের মধ্যে তুলনা করো। পানিপতের প্রথম যুদ্ধে যদি মুঘলরা জয়ী না হতো তাহলে উত্তর ভারতে কারা শাসন করতো?

(খ) শেরশাহর শাসন ব্যবস্থায় কী কী মানবিক চিন্তার পরিচয় তুমি পাও তা লেখো।

(গ) মুঘল শাসকদের রাজপুত নীতিতে কী কী মিল ও অমিল ছিল তা বিশ্লেষণ করো।

(ঘ) দাক্ষিণাত্য অভিযানের ক্ষত মুঘল শাসনের উপর কী প্রভাব ফেলেছিল?

(ঙ) মুঘল সম্রাটদের কি কোনো নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতি ছিল? উত্তরাধিকারের বিষয়টি কেমনভাবে তাঁদের শাসনকে প্রভাবিত করেছিল?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) যদি তুমি বাদশাহ আকবরের মতো বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের দেশে সম্রাট হতে তাহলে তোমার ধর্ম নীতি কী হতো?

(খ) মনে করো তুমি সম্রাট ঔরঙ্গজেব। তাহলে কেমন ভাবে তুমি দাক্ষিণাত্যের সমস্যার মোকাবিলা করতে?

(গ) মনে করো তুমি খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের একজন মারাঠা মনসবদার। তোমার জায়গির থেকে আয় কমে গেছে। এই অবস্থায় মুঘল ও মারাঠাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে। তুমি কী করবে? কেন করবে?

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় নগর, বণিক ও বাণিজ্য

৬.১ মধ্য যুগের ভারতের শহর

শহর, নগর শব্দগুলো সবারই জানা। 'নগর' শব্দটা সংস্কৃত থেকে এসেছে। আবার 'শহর' কথাটা ফারসি। সুলতানি ও মুঘল আমলে ভারতে গ্রাম ছিল, আবার ছিল অনেক শহর বা নগর। তার কোনোটা ছিল আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কারণেও শহর গড়ে উঠত। আবার ধর্মীয় স্থান বা মন্দির-মসজিদকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল কোনো কোনো শহর। এখানে আমরা সেই শহরের ইতিকথাই জানব। কেমনভাবে তৈরি হয় শহর, কেমনভাবে তা ছড়িয়ে পড়ে। কখনও বা শহরের গুরুত্ব কমে আসে, কখনও বাড়ে। মধ্যযুগের ভারতের শহরগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি আজও আছে, তবে তাদের আকার ও প্রকৃতি অনেক বদলেছে। এই শহরগুলো বেশিরভাগ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল। এর মধ্যে আমরা এখানে বেছে নিয়েছি দিল্লি শহরকে। সেই কবে থেকে ভারতের রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে দিল্লি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এর বাইরে আরো অনেক উল্লেখযোগ্য শহর ছিল। যেমন, বাংলার পাণ্ডুয়া, গৌড়, নবদ্বীপ, চট্টগ্রাম, পাঞ্জাবের লাহোর, উত্তর ভারতে আগ্রা, মুঘল সম্রাট আকবরের তৈরি রাজধানী ফতেপুর সিকরি, দাক্ষিণাত্যে বুরহানপুর, গোলকোণ্ডা ও বিজাপুর এবং পশ্চিমে আহমেদাবাদ, সুরাট ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে আমরা দিল্লি শহরের কথা বিশেষ করে পড়ব।

ব্যবসা-বাণিজ্যকে ঘিরে তৈরি হওয়া আর কোনো শহরের কথা তোমরা জানো? দরকারে বাড়ির বড়োদের বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

৬.১.১ সুলতানদের রাজধানী দিল্লি : খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের গোড়া পর্যন্ত

ভৌগোলিকভাবে দিল্লির অবস্থান আরাবল্লি শৈলশিরার একটি প্রান্ত ও যমুনা নদীবিধৌত সমতলের সংযোগস্থলে। এখানে আরাবল্লির পাথর দিয়ে জমির ঢাল অনুযায়ী সুরক্ষিত দুর্গনির্মাণ করা সহজ ছিল। আবার, যমুনা নদী এখানে প্রধান জলপথ এবং শহরের পূর্ব দিকের প্রাকৃতিক সীমানা। ফলে বহু যুগ ধরেই একদিকে রাজারাজড়া, অন্যদিকে বণিকবৃন্দ এই অঞ্চলটির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

টুকরো কথা

অনেক কালের দিল্লি

দিল্লি শহরটি অনেকবার ভাঙা-গড়া হয়েছে। মহাভারতে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে একটি নগরের কথা আছে। তাকেই কেউ কেউ আধুনিক দিল্লি নগরীর আদি রূপ মনে করেন। মৌর্য শাসকদের জনৈক বংশধরের আমলে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে দিল্লির নাম পাওয়া যায়। এর অনেক কাল পরে খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে রাজপুত শাসকদের একটি গোষ্ঠী দিল্লিতে শাসন করত। তাদের হঠিয়ে চৌহান রাজপুতরা খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে দিল্লি দখল করে নেয়। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মহম্মদ ঘুরির সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লিতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আজ পর্যন্ত মধ্য যুগের দিল্লির সাতটি নাগরিক বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে।

মধ্য যুগে দিল্লি শহরের উৎপত্তি ও বিকাশের দুটি পর্যায় ছিল। একটি হলো খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের দিল্লি, অপরটি হলো সপ্তদশ শতকে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের তৈরি শাহজাহানাবাদ। এখানে আমরা এই দুই পর্যায়ে দিল্লি শহর কেমনভাবে বদলে গেছে তার কথা পড়ব।

কুতুবউদ্দিন আইবকের আমলে দিল্লি তৈরি হয়েছিল রাজপুত শাসকদের শহর কিলা রাই পিথোরাকে কেন্দ্র করে। এটাই ছিল সুলতানি আমলের প্রথম দিল্লি বা কুতুব দিল্লি। পরবর্তী কালে গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে গিয়াসপুর নামে একটি শহরতলি তৈরি হয়েছিল যমুনার পারে। বলবনের পৌত্র কায়কোবাদ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষে যমুনার তীরে কিলোঘড়ি প্রাসাদ তৈরি করেন। জালালউদ্দিন খলজির আমলে একে ঘিরেই 'নতুন শহর' (*শহর-ই নও*) তৈরি হয়। এই শহরে আমির ও সর্দার শ্রেণির লোকেরা এসে ভিড় করে। তাদের সঙ্গে ছিল গায়ক ও বাজনাদার মানুষজন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময় মোঙ্গল আক্রমণের হাত থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সিরিতে শক্তপোক্ত কেল্লা শহর বানানো হয়েছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক অনুচরদের নিয়ে বসবাসের জন্য 'পুরোনো শহর' থেকে দূরে বানিয়েছিলেন তুঘলকাবাদ। তবে সেটি কখনই পুরোপুরি একটি রাজধানী বা বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি। মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে কুতুব দিল্লি, সিরি ও তাঁর নিজের তৈরি জাহানপনাহকে একটি প্রাচীর দিয়ে ঘিরে বৃহত্তর শহর হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সে কাজ অসমাপ্ত রয়ে যায়। এত কিছুর মধ্যে কিন্তু সুলতানি আমলের প্রথম দিল্লি (কুতুব দিল্লি বা পুরোনো দিল্লি) কখনই গুরুত্ব হারায়নি।

মানচিত্র ৬.১ : দিল্লির সাতটি শহর

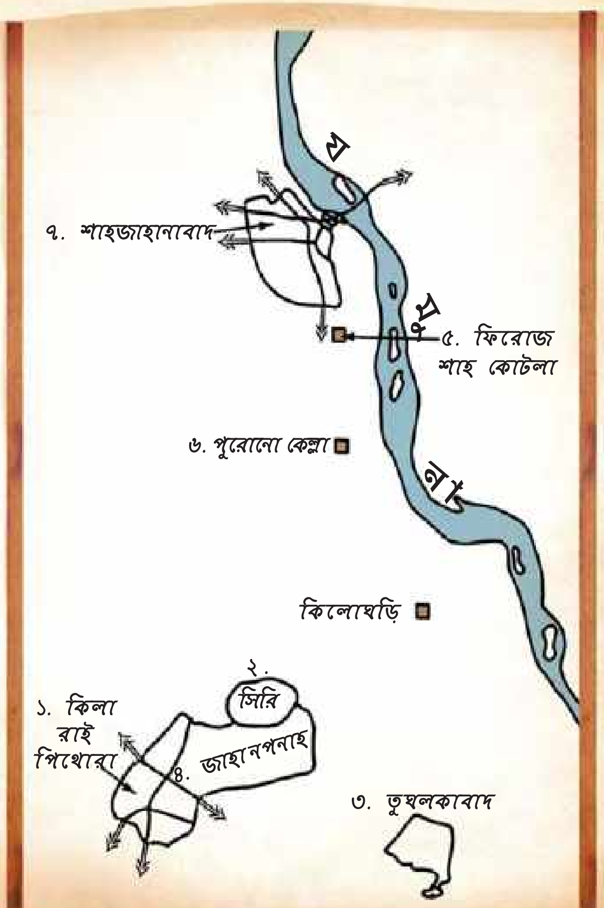

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

টুকরো কথা

ইলতুৎমিশের 'নতুন শহর'

সুলতান ইলতুৎমিশের আমলে (১২১১-'৩৬ খ্রিঃ) দিল্লি শহর গড়ে ওঠার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ঐতিহাসিক ইসামি। তিনি লিখেছেন যে, প্রদীপের আলোকশিখার চারপাশে যেমন ভাবে পতঙ্গের ভিড় জমে ওঠে, তেমনি আরব, ইরান, চিন, মধ্য এশিয়া বা বাইজানটাইন থেকে অভিজাত ব্যক্তি, নানা ধরনের শিল্পী-কারিগর, চিকিৎসক, রত্ন-ব্যবসায়ী, সাধু-সন্ত সকলেই এসে ভিড় করল ইলতুৎমিশের 'নতুন শহর'-এ।

শহরের নাম	প্রতিষ্ঠাতা	রাজবংশ	সময়
১. কিলা রাই পিথোরা	পৃথ্বীরাজ	চৌহান (রাজপুত)	আনুমানিক ১১৮০ খ্রিস্টাব্দ
২. সিরি	আলাউদ্দিন খলজি	খলজি (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দ
৩. তুঘলকাবাদ	গিয়াস উদ্দিন তুঘলক	তুঘলক (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩২১ খ্রিস্টাব্দ
৪. জাহানপনাহ	মহম্মদ বিন তুঘলক	তুঘলক (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ
৫. ফিরোজাবাদ (ফিরোজ শাহ কোটলা)	ফিরোজ শাহ তুঘলক	তুঘলক (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দ
৬. দীন পনাহ, শেরগাহ (পুরোনো কেল্লা)	হুমায়ুন শেরশাহ	মুঘল সুর (আফগান)	আনুমানিক ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ আনুমানিক ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ
৭. শাহজাহানাবাদ	শাহজাহান	মুঘল	আনুমানিক ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ

দিল্লিতে সুলতানি শাসন যখন একটু-একটু করে বেড়ে উঠেছে, সে সময় মধ্য এশিয়ায় এক দুর্ধর্ষ জাতি ছিল মোঙ্গলরা। এদের কথা আমরা আগেই জেনেছি। এই মোঙ্গলরা ইরাকের বাগদাদ শহরের অনেক ক্ষতি করেছিল। বাগদাদ ছিল মুসলমান সভ্যতার এক বড়ো কেন্দ্র। বাগদাদের দুরবস্থার ফলে দিল্লির গুরুত্ব বেড়ে যায়। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে অনেক লোক এসে বাস করতে শুরু করে দিল্লিতে। দিল্লি হয়ে ওঠে সুফি সাধকদের অন্যতম পীঠস্থান। এজন্য দিল্লির নামই হয়ে গিয়েছিল *হজরত-ই দিল্লি*। সুফি সাধকদের মধ্যে সেই সময়ে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া। সুফি সাধকদের কথা আমরা পড়বো সপ্তম অধ্যায়ে।

ভেবে দেখোতো এই দিল্লি শহরটি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কেন?

টুকরো কথা

দিল্লি এখনও অনেক দূর

দিল্লি শহর নিয়ে গল্পের শেষ নেই। এর মধ্যে একটি বিখ্যাত গল্প শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া ও সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলককে (শাসনকাল ১৩২০-'২৪ খ্রিঃ) নিয়ে। একবার সুলতান গিয়াসউদ্দিন নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে শহরের বাইরে নির্বাসন দিয়েছিলেন। তাতেও নিজামউদ্দিন দমে যাননি। এরপর সুলতান এক যুদ্ধযাত্রায় গেলেন বাংলাদেশে। যাওয়ার সময়ে হুকুম করলেন যে, তিনি রাজধানীতে ফেরার আগেই যেন নিজামউদ্দিন পাকাপাকিভাবে শহর ছেড়ে চলে যান। নিজামউদ্দিনের শিষ্যরা তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। নিজামউদ্দিন তাঁদের শুধু বললেন, 'হনুজ দিল্লি দূর অস্ত' (দিল্লি এখনও অনেক দূর)। যুদ্ধযাত্রা থেকে ফেরার পথে সুলতান গিয়াসউদ্দিনকে স্বাগত জানানোর জন্য তৈরি একটি মঞ্চ শামিয়ানাসুদ্ধ ভেঙে পড়ে। এতে চাপা পড়ে গিয়াসউদ্দিন মারা যান। সুলতানের আর রাজধানীতে ফেরা হলো না। এই ঘটনায় দিল্লিতে নিজামউদ্দিনের জয়জয়কার ঘোষিত হলো।

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দিল্লি শহরের চেহারা বদলে যায়। আগেকার মতো আরাবল্লির পাথুরে এলাকায় শহর তৈরি না করে ফিরোজ তুঘলক যে ফিরোজাবাদ শহর গড়লেন তার মধ্যমণি ছিল ফিরোজ শাহ কোটলা। কোটলা মানে দুর্গ। এই শহর ছিল যমুনা নদীর পাড় বরাবর। এই পরিকল্পনার ফলে শহরে জলের সমস্যা মেটানো গেল। নদীপথে বয়ে আনা জিনিসপত্র শহরের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সহজ হলো ও তার জন্য খরচও কমল। সুলতানদের পুরোনো দিল্লি শহর আস্তে আস্তে ক্ষয় পেতে লাগল। ফিরোজাবাদের পত্তনের ফলে এই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হয়েছিল কি না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে ফিরোজ তুঘলক দিল্লিতে শহর

পত্তনের ধাঁচটি বদলে দিয়েছিলেন। এর পর থেকে নদীর ধারেই আফগান ও মুঘলরা তাদের একাধিক কেল্লা ও শহর বানিয়েছিল।

সুলতানি আমলের দিল্লিতে অনেকগুলো বাজারের কথা জানা যায়। এখানে দেশ-বিদেশের বণিকরা নানা ধরনের পণ্য নিয়ে আসত। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা পরে আরও বেশি করে জানব। (**৬.২ একক দেখো**)

দিল্লি শহরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এর মিশ্র ধরনের বসতি। এখানে কোনো ধর্মীয় বা জাতিগত পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে বসতি গড়ে ওঠেনি। সাধারণত একই পেশার কারিগররা জাত-ধর্ম-নির্বিশেষে কাজের টানে একসাথে একটি মহল্লায় থাকত। শহরের গড়নের মধ্যে সবসময় পরিকল্পনার ছাপ বিশেষ ছিল না। কয়েক দশক পর পর শহরের অবস্থান বদলে যাওয়ায় জাত-পাতভিত্তিক মহল্লা গড়ে ওঠার সুযোগও ছিল কম। শহরের আশেপাশে গড়ে উঠেছিল *কসবা* বা শহরতলি। এগুলোকে ছোটো শহরও বলা চলে। কসবাগুলো শহরের মতো পাঁচিলঘেরা হতো না। গ্রাম ও শহরতলির সীমানাও নির্দিষ্ট ছিল না।

দিল্লি শহরের প্রধান সমস্যা ছিল জলের অভাব। অত লোকের জন্য বর্ষার জল ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। সুলতানরা কয়েকটি *হৌজ* বা পুকুর খুঁড়ে দিলেও জলের সমস্যা থেকেই যায়। কাজেই শহর আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে থাকে যমুনা নদীর দিকে। নদী ঘন ঘন খাত পরিবর্তন করলে জলের সমস্যা আরও বেড়ে যায়। সুলতান ফিরোজ শাহ শহরে জল আনার জন্য খাল কেটেছিলেন। এ ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও শহরে জলাভাব ও স্থানাভাব দেখা দেয়।

টুকরো কথা

সুলতানি আমলে জলসংরক্ষণ ও জল সরবরাহ

‘হৌজ’ বা ‘তালাও’ (জলাধার) ছিল দিল্লি শহরের জল সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সুশাসনের প্রতীক হিসাবে জনসাধারণের জন্য সুলতানরা জলাধার খনন করতেন ও সংস্কার করতেন। সুলতান ইলতুৎমিশ খনন করেছিল ‘হৌজ-ই শামসি’ বা ‘হৌজ-ই সুলতানি’। আটকোণা এই জলাধারের বর্ণনা দিয়েছেন ইবন বতুতা। আলাউদ্দিন খলজি খনন করেন আরও বড়ো চারকোণা জলাধার ‘হৌজ-ই আলাই’। পরে এর নাম হয় হৌজ-ই খাস। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নতুন বানানো তুঘলকাবাদে আরেকটি জলাশয় তৈরি করেন, যেখানে উঁচু বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা হতো। উল্টোদিকে, সুলতানি রাষ্ট্রের বিরোধী স্থানীয় শক্তি শহরের অধিবাসীদের বিপাকে ফেলার জন্য ‘হৌজ-ই শামসি’র নালাগুলোর উপর বাঁধ দিয়ে দিত। গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে মেও দস্যুদের ভয়ে শহরের লোকজন জল আনতে তালাও পর্যন্ত যেতে পারত না। ফিরোজ তুঘলক এইসব নালার ওপর তৈরি বাঁধ ভেঙে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করেন।

যে এলাকায় তুমি থাকো সেখানকার বাজার-হাট কেমন? তার সঙ্গে সুলতানি ও মুঘল আমলের দিল্লির বাজারের কী কী মিল-অমিল দেখতে পাওয়া যাবে?

ছবি ৬.১ :

হৌজ-ই খাস জলাশয় (দক্ষিণ দিল্লি)। পিছনে মাদ্রাসা ও সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সমাধি সৌধ।

দিল্লির সঙ্গে উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশের যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন পথ ছিল। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে দিল্লি ও দৌলতাবাদের মধ্যে পথ বানানো হয়। কিন্তু এই সব পথের ওপর মেও এবং জাঠরা হানা দিয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দিত। সুলতানরা চেষ্টা করতেন পথগুলো খোলা রাখার।

সুলতানি শাসনের সাড়ে তিনশো বছরে দিল্লির শাসকরা এগারোবার তাঁদের শাসনকেন্দ্র বদলিয়েছেন। এর ফলে কোন জায়গাতেই স্থায়ীভাবে শহরটির ভিত মজবুত হয়নি। সুলতানদের দিল্লি মোটামুটিভাবে তিনশো বছর টিকে ছিল। ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সিকান্দর লোদির সময়ে আগ্রা শহরের বিকাশ শুরু হয়। সুলতানি সাম্রাজ্যের রাজধানী চলে আসে আগ্রাতে। এরপর প্রায় একশো তিরিশ-চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে দিল্লি শহরের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে এসেছিল। যদিও সুফি সাধকদের ঐতিহ্যের কেন্দ্র হিসাবে এই শহর হিন্দুস্তানের জনজীবনে বরাবরই মর্যাদা পেয়ে এসেছিল।

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর পানিপতের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে হারিয়ে আগ্রা ও দিল্লি উভয়ই দখল করেছিলেন। শেরশাহর শাসনকালে যমুনার পশ্চিমদিকে *কিলা-ই কুহনা* (পুরোনো কেল্লা) ছিল রাজধানী। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্য ভাগে মুঘল বাদশাহ শাহজাহানের সময়ে যমুনা নদীর পশ্চিমে শাহজাহানাবাদ নগরের পত্তন হলে দিল্লি পুনরায় রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে সরগরম হয়ে ওঠে।

ভেবে দেখোতো মধ্যযুগের শহরে মাটির ওপরের জলাধারগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেন? তোমার স্থানীয় অঞ্চলে পানীয় জল কীভাবে পাওয়া যায়?

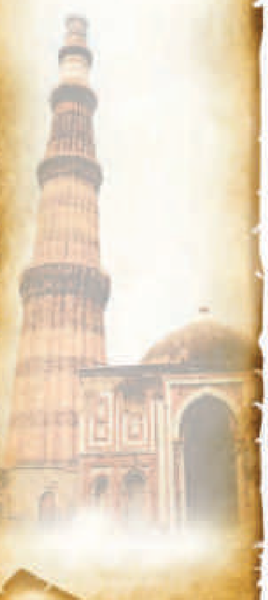

টুকরো কথা

দিল্লি সুলতানি আর মুঘল সাম্রাজ্য

বিশ্বের বড়ো-বড়ো সাম্রাজ্যগুলো সাধারণত কোন একটি রাজবংশের নাম দ্বারা পরিচিত। যেমন ভারতের মৌর্য, গুপ্ত, চোল, মুঘল বা চিনের মাঞ্চু। তেমনই ইরানের সফাবি, তুরস্কের অটোমান, ইউরোপে ফ্রাঙ্ক, হ্যাপসবার্গ, রোমানভ। মেক্সিকোর আজটেক ও দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা সাম্রাজ্যগুলোও কোনো-না-কোনো রাজবংশের নামে পরিচিত। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন প্রাচীন বিশ্বে এথেন্স বা রোম শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্য। তেমনই দিল্লির সুলতানি বা বিজয়নগরের সাম্রাজ্যগুলিও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এইসব ক্ষেত্রে 'রোম সাম্রাজ্য' বা 'দিল্লি সুলতানি' নামটাই থেকে গেছে। দিল্লি সুলতানিতে যে রাজবংশই ক্ষমতায় আসুক না কেন শহরটির গুরুত্ব কমেনি। পরবর্তীকালে মুঘল আমলে যেমন বারবার শাসনকেন্দ্র বদলেছে, দিল্লি সুলতানিতে তা হয়নি। সবকটি শাসকবংশ দিল্লিকেই তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র বানিয়েছে।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তিকেন্দ্র : আগ্রা-ফতেহপুর সিকরি-লাহোর

আকবরের শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্যে শাসনকেন্দ্র বারবার বদলেছে। দিল্লি সুলতানির মতো এখানে কোনো ভৌগোলিক এলাকা ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল না। মুঘল শাসক কোথায় অবস্থান করেছেন সেটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মুঘল আমলে আগ্রা, ফতেহপুর সিকরি এলাহাবাদ ও লাহোর প্রত্যেকটি শহরই ছিল অতি সুরক্ষিত, প্রায়-দুর্ভেদ্য দুর্গনগরী অথবা শাসনকেন্দ্র। শেখ সেলিম চিশতির স্মৃতিধন্য সিকরি গ্রামে আকবর তৈরি করেন নতুন রাজধানী ফতেহপুর। তবে আগ্রা দুর্গশহর হওয়ায় কখনই এর গুরুত্ব কমেনি। জলের অভাবে ফতেহপুর সিকরি ছেড়ে আকবর লাহোর চলে যান ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে। যেখান থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নজর রাখাও বেশি সুবিধাজনক ছিল। ফের ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে আগ্রা থেকেই মুঘল শাসন পরিচালনা করা শুরু হয়।

গঙ্গা ও যমুনার সন্ধিস্থলে বানানো এলাহাবাদ দুর্গ থেকে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের ওপর নজরদারি করা যেত। রাজপুতানার আজমের ও উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু নদের পারে তৈরী আটক দুর্গ ও তার কিছুটা পূর্বদিকে রোহ্‌টাস দুর্গ ছিল অবস্থানগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই কেন্দ্রগুলোর সাহায্যে সিন্ধু-যমুনা-গঙ্গা অববাহিকার সুবিশাল, উর্বর, সমতল অঞ্চলের জনগণ, কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ধনসম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যেত।

আকবরের আমলে বুন্দেলখণ্ডের প্রধান দুর্গনগরী গোয়ালিয়র, রাজপুতানার চিতোর ও রণথম্ভোর এবং দাক্ষিণাত্যের অসিরগড় দুর্গও মুঘলরা দখল করেছিল। তবে হিন্দুস্তানের (উত্তর ভারতের) দুর্গগুলোই ছিল মুঘলদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র।

৬.১.২ শাহজাহানাবাদ : মুঘল-রাজধানী : খ্রিস্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক

দিল্লিতে সুলতানি আমলে যে শহরগুলি গড়ে উঠেছিল তাদের থেকে খানিকটা দূরে যমুনা নদীর পশ্চিমে একটি উঁচু জায়গায় শাহজাহানাবাদ গড়ে উঠেছিল। বাদশাহ শাহজাহান সুলতানদের আমলের দিল্লি শহরের ধ্বংসাবশেষকে রাজধানী হিসাবে বেছে নেননি। তিনি একটি নতুন এলাকায় শহর পত্তন করে সার্বভৌম শাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই শহর বানানোর সময় ইসলামি ও হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে মুঘল শাসকরা ততদিনে ভারতীয় হয়ে উঠেছিলেন।

টুকরো কথা

মুঘলদের রাজধানী বদল : আগ্রা থেকে শাহজাহানাবাদ দিল্লি

যমুনা নদীর পাড় ভেঙে আগ্রা শহর ক্রমশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। শহরের পথঘাটও ঘিঞ্জি হয়ে পড়ে। আগ্রার প্রাসাদদুর্গ মুঘল বাদশাহের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্য আর যথেষ্ট বড়ো ছিল না। তাই তৈরি করা হলো ***শাহজাহানাবাদ*** *(শাহজাহানের শহর)। এতে ভারতের রাজনীতিতে দিল্লি শহরের যে গুরুত্ব তাকেও স্বীকার করা হলো। শাহজাহানাবাদ তৈরি হয়েছিল ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান আগ্রা থেকে সেখানে চলে আসেন।*

চাঁদনি চকের গল্প

লালকেল্লা থেকে জাহান আরা বেগমের চক পর্যন্ত বিস্তৃত বাজারের উত্তর দিকে একটি সরাইখানা ও বাগান এবং দক্ষিণে একটি স্নানাগার তৈরি করে দিয়েছিলেন শাহজাহানের কন্যা জাহান আরা। জনশ্রুতি হলো, চাঁদনি রাতে জলে চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করত বলে ওই জায়গার নাম হয়েছে ***চাঁদনি চক****। আবার, এও গল্প আছে যে ওই বাজারে সোনা-রুপোর টাকার ঝিলিকের জন্য চাঁদনি চক নামটি তৈরি হয়েছে।*

এই শহরের মুখ্য স্থাপত্যগুলো হলো লাল রঙের বেলে পাথরে তৈরি *কিলা মুবারক* (‘লালকেল্লা’ নামেই বিখ্যাত) ও জামা মসজিদ। শাহজাহানাবাদ শহরকে ঘিরে একটি খুব উঁচু ও বিরাট পাথরের পাঁচিল তৈরি করা হয়েছিল। এর গায়ে সাতাশটা বুরুজ (স্তম্ভ) ও অনেকগুলো ছোটোবড়ো দরজা বানানো হয়েছিল, যায় মধ্যে সাতটা বড়ো দরজা ছিল। বড়ো দরজাগুলো আজও আছে।

টুকরো কথা

দিল্লির লালকেল্লা

লালকেল্লার আয়তন আগ্রা দুর্গের দ্বিগুণ। এর পূর্বদিকে যমুনা নদী এবং পশ্চিমে পরিখা। দুর্গের চারটি বড়ো দরজা, দুটি ছোটো দরজা ও একুশটি বুরুজ ছিল। দুর্গের মধ্যে একভাগে ছিল রাজপরিবারের বাসস্থান, অন্য দিকে বিভিন্ন দপ্তর। সেই সময়ে ৯১ লক্ষ টাকা খরচ করে এটি বানানো হয়েছিল। দুর্গ ও শহরের মধ্যে নালা দিয়ে সেকালে জল বয়ে যেত। এই জলবাহী নালাগুলোকে বলা হতো ‘নেহর-ই বিহিশ্‌ত’ (স্বর্গের খাল)। ইসলামি রীতি অনুযায়ী এগুলোকে সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির প্রতীক ভাবা হতো।

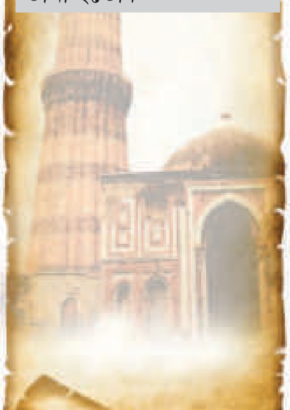

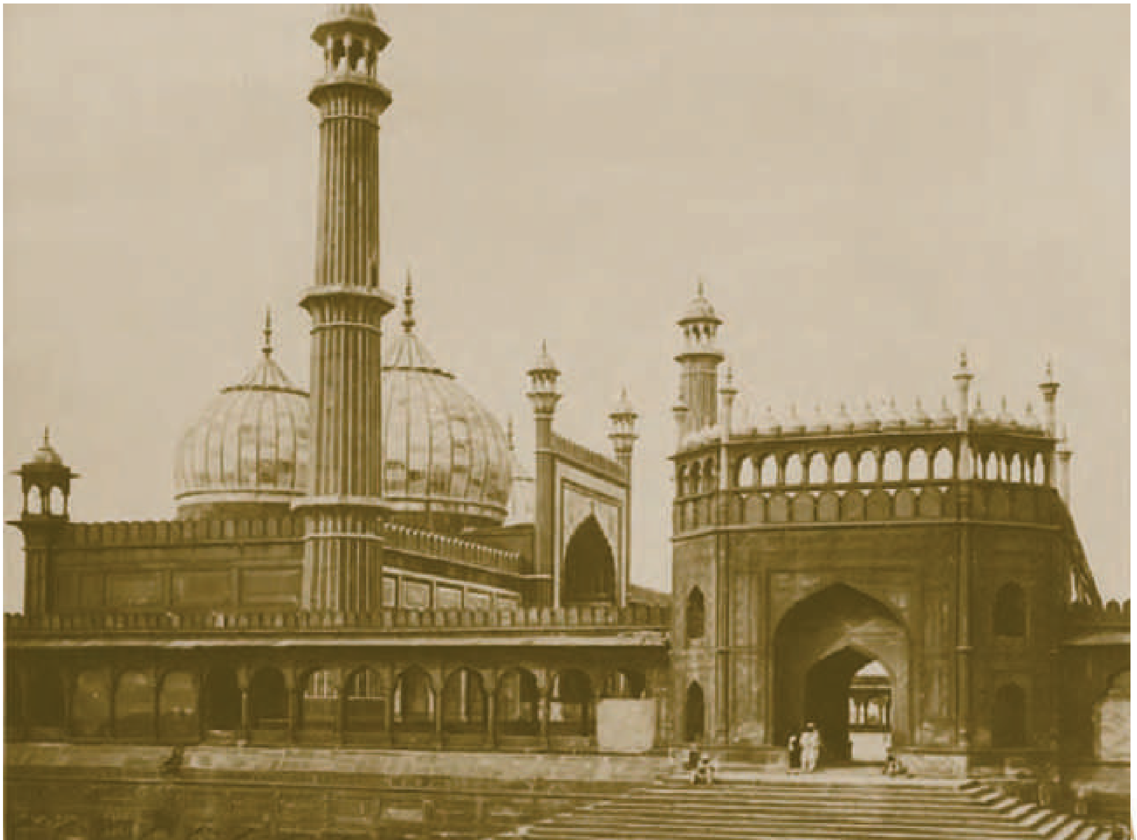

ছবি ৬.২ :
মসজিদ-ই জাহান-নুমা (জামা মসজিদ), পুরানো দিল্লি। এই ছবিটি আনুমানিক ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের একটি আলোকচিত্র।

শাহজাহানাবাদেরও নাগরিক বসতি ছিল মিশ্র প্রকৃতির। এখানে নানা শ্রেণির মানুষ বসবাস করত নানা ধরনের বাড়িতে। রাজপুত্র ও উচ্চপদস্থ আমিররা সুন্দর বাগানবাড়িতে থাকত। ধনী বণিকরা টালি দিয়ে সাজানো ইট ও পাথরের বাড়িতে থাকত। সাধারণ ব্যবসায়ীরা থাকত নিজেদের দোকানের ওপরে বা পেছন দিকের ঘরে। সবচেয়ে বড়ো ও সুন্দর বাড়িগুলোকে বলা হতো *হাভেলি*। এর থেকে নীচুস্তরের বাড়িকে *মকান* ও *কোঠি* বলা হতো। সবচেয়ে ছোট ঘরকে বলা হতো *কোঠরি*। এ ছাড়া ছিল আলাদা বাংলো বাড়ি। বড়ো বড়ো বাড়ির অশেপাশে মাটি ও খড় দিয়ে তৈরি বহু ছোটো ছোটো কুঁড়েঘর ছিল। এই সব কুঁড়েতে সাধারণ সৈনিক ,দাসদাসী, কারিগর প্রমুখ মানুষজন থাকত। কুঁড়েতে আগুন লেগে মাঝে-মধ্যে অনেক লোক ও গবাদি পশু মারা যেত বলে জানা যায়। তবে বসতি এলাকার মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না। উচ্চপদস্থ আমির ও গরিব কারিগর একই মহল্লায় পাশাপাশি থাকত। শাহজাহানাবাদের প্রধান রাজপথ ছিল দুটি। রাজপথকে *বাজার* বলা হতো, কারণ তার দু-পাশে সারিবদ্ধ দোকান ছিল।

কোনো কোনো উৎসবে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে লোক এক হয়ে পরব উদ্‌যাপন করত। যেমন দেওয়ালির সময় হিন্দু-মুসলমান একইসঙ্গে দিল্লির প্রখ্যাত সুফি সাধক শেখ নাসিরউদ্দিন 'চিরাগ-ই দিল্লি'-র (দিল্লির প্রদীপ) দরগায় আলোর উৎসব পালন করত। মহরমে শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায় যৌথ ভাবে অংশ নিত।

শাহজাহানাবাদ রাজধানী শহর হিসাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। তার কিছু কিছু অবশেষ আজও রয়ে গেছে। সুলতানি রাজধানীগুলোর থেকে এর আয়ু ছিল বেশি। এর থেকে মনে হয় যে শাসক হিসাবে মুঘলরাও স্থায়িত্ব অর্জন করতে পেরেছিল।

৬.২ বণিক ও বাণিজ্য

এবারে আমরা মোটামুটিভাবে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের মধ্যেকার ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা পড়ব। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের পসরা সাজিয়ে বাণিজ্য করেছে। সেকালে রেলপথ বা আকাশপথে যাতায়াতের সুযোগ ছিল না। সড়কপথ ও জলপথই ছিল যাতায়াতের মাধ্যম। এই সব পথ অনেক ক্ষেত্রে দুর্গম হতো, পথে-ঘাটে নানা রকম বিপদ-আপদের আশঙ্কাও ছিল। তা সত্ত্বেও বণিকরা দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ভারবাহী পশুর পিঠে করে, কিংবা পালতোলা নৌকা ও জাহাজে করে মালপত্র নিয়ে যেত বেচাকেনার জন্য। এই সব বণিকদের মধ্যে যেমন ভারতীয় বণিকরা ছিল, তেমন ভারতের বাইরে থেকেও অনেক ভিনদেশী বণিক ভারতে আসত বাণিজ্য করার জন্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাণিজ্যপথের ধারে,নদী কিংবা সমুদ্রের পাড়ে গড়ে উঠেছিল নানা হাট, মণ্ডি, গঞ্জ, ছোটো-বড়ো শহর।

দিল্লির সুলতানদের আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছিল। এর নানা কারণ ছিল। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে দিল্লির সুলতানরা কয়েকটি নতুন শহর তৈরি করেন বা পুরানো শহরগুলোতে নতুন করে ঘরবাড়ি তৈরি করেন। নানা ধরনের মানুষজনের আসা-যাওয়ার ফলে কেমনভাবে মধ্য যুগের ভারতে শহর গড়ে উঠেছিল তার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় তখনকার দিনের লেখাপত্রে। এই সব শহরে সুলতানরা ও তাঁদের অভিজাতরা, সৈনিকরা ও সাধারণ মানুষ বসবাস করতে শুরু করলে শহরগুলি জনবহুল হয়ে ওঠে। শহরের প্রাসাদ, মসজিদ, বাজার, রাস্তাঘাট, সরাইখানা, স্নানাগার, জল সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি তৈরি করতে অনেক কাঁচামাল ও শ্রমিক দরকার হতো। এইসব শ্রমিকরা ছিলেন নানান জাত ও ধর্মের মানুষ। এরা কেউ ভারতীয়,কেউ বা ভারতের বাইরে থেকে আসা লোক। অনেক শ্রমিক ছিল যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হওয়া দাস।

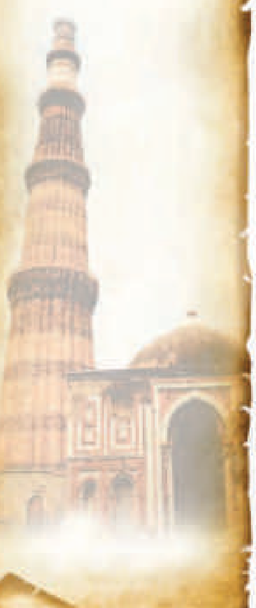

শহরগুলোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ও বাড়ি-ঘর তৈরির কাঁচামালের জোগান দেওয়ার জন্য আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল।

আবার, সে যুগে সুলতানরা তাঁদের সামরিক প্রয়োজনে বিরাট সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখতেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির আমল থেকে এদের ভরণ-পোষণের জন্য রাষ্ট্র কৃষকদের কাছ থেকে নগদে কর আদায় করত। ওই নগদ টাকা জোগাড় করার জন্য কৃষকরা ব্যবসায়ীদের কাছে তাঁদের উৎপন্ন শস্য বিক্রি করে দিতে বাধ্য হতো। সেই শস্য নিয়েও বাণিজ্য চলত। তা ছাড়া, সুলতান ও অভিজাতদের বিলাস-ব্যসনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবান জিনিসের ব্যবসা সে যুগের বাণিজ্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

৬.২.১ দেশের ভেতরের বাণিজ্য

দেশের ভিতরে সাধারণত দুই ধরনের বাণিজ্য হতো। প্রথমত, গ্রাম ও শহরের বাণিজ্য এবং দ্বিতীয়ত, দুটি শহরের মধ্যেকার বাণিজ্য। জনবহুল শহরগুলোর অধিবাসীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য গ্রাম থেকে শহরে যে সব পণ্য রপ্তানি হতো সেগুলি কমদামি জিনিস, কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে এই সব জিনিস গ্রাম থেকে শহরে আসত। এই সব জিনিসপত্রের মধ্যে থাকত নানা রকমের খাদ্যশস্য, খাবার তেল, ঘি, আনাজ, ফল, লবণ ইত্যাদি। শহরের বাজারে এইসব পণ্য বিক্রি হতো।

আবার এক শহর থেকে আরেক শহরে রপ্তানি হতো প্রধানত বেশি দামের শৌখিন জিনিসপত্র,যেগুলো ধনী,অভিজাতদের জন্যই তৈরি করত কারিগররা। এ সব জায়গায় সব জাতির ও সব ধর্মের মানুষরাই কাজ করত শিল্পী ও কারিগর হিসাবে। সুলতানদের রাজধানী দিল্লি শহরে সাম্রাজ্যের নানা এলাকা থেকে দামি মদ, সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র আমদানি করা হতো। তা ছাড়া বাংলাদেশ, করমণ্ডল ও গুজরাতের সুতি ও রেশমের কাপড়ের চাহিদা ছিল দেশের সর্বত্র। এই যুগে প্রথম চরকায় সুতো কেটে কাপড় বোনা শুরু হয়েছিল।

সুলতানি যুগে অন্যান্য হস্তশিল্পের বাণিজ্যও হতো। এর মধ্যে ছিল চামড়া, কাঠ ও ধাতু দিয়ে তৈরি জিনিস, গালিচা ইত্যাদি। এই যুগেই ভারতে প্রথম কাগজ তৈরি করা শুরু হয়। এক সময় দেখা গেল যে, দিল্লির মিঠাইওয়ালারা কাগজের মোড়কে করে মিঠাই বিক্রি করতে শুরু করেছে।

এই সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটেছিল। রাস্তার ধারে-ধারে পথিকদের জন্য গড়ে উঠেছিল সরাইখানা। এগুলোতে পথচারী ও বণিকরা তাদের মালপত্রসহ বিশ্রাম নিত। কর আদায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার

যে সব জিনিসের কথা এখানে বলা হলো তার মধ্যে কোন কোন জিনিস এখনও কেনা-বেচা হয়?

জন্য দিল্লির সুলতানরা 'তঙ্কা' (রুপোর মুদ্রা) ও 'জিতল' (তামার মুদ্রা) নামে দু-ধরনের মুদ্রা চালু করেছিলেন। এগুলোর মান ছিল যথেষ্ট ভালো।

৬.২.২ দেশ ও বিদেশের বাণিজ্য

ভারতে তৈরি জিনিসের চাহিদা ছিল ভারতের বাইরের নানা দেশে। বাণিজ্য হতো জলপথে ও স্থলপথে। গুজরাট ও মালাবারের (কেরালা) বন্দরগুলো থেকে পশ্চিমদিকে আরব সাগর, পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের তীরবর্তী দেশে যেত প্রধানত বস্ত্র, মশলা, নীল ও খাদ্যশস্য। সুলতানি আমলে যুদ্ধবন্দী দাসদেরও ভারত থেকে পশ্চিম এশিয়াতে রপ্তানি করা হতো। আবার, ওই সব দেশ থেকে আসত ঘোড়া, কাচের তৈরি সামগ্রী, সাটিন কাপড় ইত্যাদি। সব ভারতীয় শাসকই ঘোড়া আমদানিতে উৎসাহ দিত, কারণ ভারতে ভালো মানের ঘোড়া জন্মাত না। প্রধানত পারস্য, এডেন ও ইয়েমেন থেকে ভারতে ঘোড়ার আমদানি হতো। সুলতানি আমলে এবং মুঘল আমলের প্রথম দিকে গুজরাটের ব্রোচ ও ক্যাম্বে বন্দরদুটি এই বাণিজ্যের প্রবেশপথ ছিল। আলাউদ্দিন খলজি গুজরাট জয় করলে দিল্লি সুলতানির সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। সিন্ধু প্রদেশের থেকে বিশেষ ধরনের কাপড়, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছ ওই সব দেশে রপ্তানি হতো। মুঘল আমলে সুরাট বন্দর ছিল ভারতের প্রধান বন্দর। এর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির ভালো যোগাযোগ ছিল।

পূর্বদিকে ভারতীয় সামগ্রীর চাহিদা ছিল বঙ্গোপসাগরের আশেপাশের দেশগুলিতে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। গুজরাট থেকে ওই সব দেশে যেত রঙিন কাপড়, বাংলা থেকে রপ্তানি হতো সুতির কাপড়, রেশমবস্ত্র ও চিনি। এর বিনিময়ে গুজরাটে আসত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলা। মালদ্বীপ থেকে আমদানি করা কড়ি ওই যুগে বাংলায় মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এই ভাবে ভারতের বিভিন্ন উপকূল থেকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জলপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

সড়কপথে ভারতীয় সামগ্রীর ব্যবসা হতো প্রধানত মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে। মুলতান শহর ছিল এই বাণিজ্যের কেন্দ্র। সড়কপথে মধ্য এশিয়া থেকে মূল্যবান ধাতু যেমন সোনা, রুপো ও রত্ন আমদানি হতো। মুদ্রা তৈরিতে ওই সব মূল্যবান ধাতুর চাহিদা ছিল। তাছাড়া, অলংকারের জন্যও ঐ ধাতুগুলির চাহিদা ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া, ইরাক ও চিন থেকে আসত ব্রোকেড ও রেশম। এই পণ্যগুলি ছিল মূল্যবান এবং এর চাহিদা ছিল সমাজের উঁচুতলার মানুষের কাছে।

টুকরো কথা

টাকাকড়ির কথা

সুলতানি আমলে প্রধান মুদ্রা ছিল সোনার মোহর, রুপোর তঙ্কা ও তামার জিতল। ওই আমলের শেষদিকে উত্তর ভারতে চলত এক রকমের রুপো এবং তামা মেশানো মুদ্রা। শেরশাহ সোনা, রুপো ও তামা এই তিন রকমের মুদ্রা চালু করেন, যা পরে মুঘল সম্রাটরাও অনুসরণ করেছিল।

মুঘল আমলের সোনার মুদ্রা 'মোহর' বা 'আশরফি' নামে পরিচিত ছিল। এ যুগে প্রধান মুদ্রা ছিল রুপো দিয়ে তৈরি 'রুপায়া'। এটা দিয়েই ব্যবসা-বাণিজ্য হতো প্রজারা কর দিত। এ ছাড়া ছিল তামা দিয়ে তৈরি মুদ্রা 'দাম'। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগরে সোনা দিয়ে তৈরি 'হোন' ছিল প্রধান মুদ্রা। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পরে দাক্ষিণাত্যের অন্য রাজ্যেও এই নামের মুদ্রা চালু ছিল।

ভারতীয় বাণিজ্যের জগৎ

বণিক

করওয়ানি, নায়ক, বনজারা-রা শস্য পরিবহণ করে নিয়ে আসত। শাহ বা মুলতানিরা দূরপাল্লার বাণিজ্যে দক্ষ ছিল। এরা সুদের কারবারও করত। মুলতানিরা বেশির ভাগই ছিল হিন্দু, তবে মুসলমান বণিকদের কথাও জানা যায়। বড়ো-বড়ো বণিক গোষ্ঠী ছাড়াও অনেক ছোটো ফেরিওয়ালাও ছিল। এমনকি সুফি সাধকদের মধ্যেও কেউ কেউ ছোটোখাটো ব্যবসা করতেন।

সরাফ

এরা আজকের ব্যাঙ্কের মতো সেকালে টাকা বিনিময়ের কাজ করত। এরা ধাতুর মুদ্রা কতটা খাঁটি তা-ও পরীক্ষা করে দেখে নিত।

দালাল

এরা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখত, জিনিসের দাম ঠিক করে দিত।

বিমা ব্যবস্থা

ব্যবসায়ীরা দূরপাল্লার বাণিজ্যে ঝুঁকি নিয়ে পণ্য পাঠাতে পারত।

এবারে ভেবে দেখোতো যে এই বিরাট ও বিচিত্র বাণিজ্য-জগতের মানুষজন কারা ছিল? শ্রেণিকক্ষে চারজনের দল করো। এবারে ধরো তোমাদের একজন বণিক, একজন সরাফ, একজন দালাল ও একজন ক্রেতা। জিনিস কেনা-বেচা নিয়ে তোমাদের চারজনের মধ্যে কেমন কথাবার্তা হবে তা চারজনেই লিখে/অভিনয় করে দেখাও।

টুকরো কথা

হুণ্ডি

*তুর্কি শাসকদের আমলে কাগজের ব্যবহার শুরু হলে সরাফরা **'হুণ্ডি'** নামে এক ধরনের কাগজ চালু করেছিল। বণিকরা কোন এক জায়গায় সরাফকে টাকা জমা দিয়ে সেই কাগজ কিনে নিয়ে অন্য জায়গায় তা প্রয়োজন মতো ভাঙিয়ে নিত। এতে বণিকদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টাকা নিয়ে যাওয়ার খুব সুবিধা হয়েছিল।*

ছবি ৬.৩ : মধ্য যুগের আফগানিস্তানের একটি বাজারে বাদাম বেচা-কেনা হচ্ছে। *বাবরনামা*-র ছবি।

টুকরো কথা

যুদ্ধ ও বাণিজ্য

মুঘল সম্রাট আকবরের আমলের একজন পোর্তুগিজ যাজক ফাদার আন্তোনিও মনসেরাট মুঘলদের একটি যুদ্ধযাত্রার বিবরণ লিখে গেছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, বিশাল আকারের মুঘল বাহিনীর ভরণ-পোষণের জন্য সেনাবাহিনীর যাত্রপথের দু-ধারে সম্রাটের প্রতিনিধিরা ছড়িয়ে পড়ত রসদ জোগাড় করতে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেওয়া হতো বাহিনীর সঙ্গে চলমান বাজারে এসে জিনিসপত্র বিক্রিকরে যেতে।এইভাবে, যুদ্ধযাত্রাকে কেন্দ্র করেও খাদ্য দ্রব্যের বাণিজ্য চলত মধ্যযুগের ভারতে।

মধ্যযুগে সমুদ্র বাণিজ্যে নানা দেশের বণিকরাই অংশগ্রহণ করত। ভারতীয় বণিকদের মধ্যে গুজরাটি, মালাবারি, তামিল, ওড়িয়া, তেলুগু ও বাঙালি বণিকরা সুনাম অর্জন করেছিল। এই বণিকরা ধর্মে ছিল হিন্দু, মুসলমান ও জৈন। এরা আরব, পারসিক ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য করত। এদের মধ্যে কোনো কোনো বণিক ছিল খুব ধনী, তাদের বলা হতো বণিক-সম্রাট। বড়ো বড়ো ভারতীয় বণিকদের নিজস্ব জাহাজ থাকত। বাকিরা অন্যদের জাহাজে করে জিনিসপত্র পাঠাত।

টুকরো কথা

পথের হদিশ

উত্তর ভারতে গঙ্গা ও যমুনা নদী ছিল প্রধান জলপথ। আগ্রা, এলাহাবাদ, বারাণসী, পাটনা, রাজমহল, হুগলি, ঢাকা প্রভৃতি শহর নদীগুলোর মাধ্যমে যুক্ত ছিল। উত্তর-পশ্চিমে লাহোর থেকে শুরু করে দক্ষিণে সিন্ধু নদের মোহনা পর্যন্ত এলাকা জলপথে যুক্ত ছিল। উত্তর ভারত থেকে গুজরাট যাওয়ার দুটি সড়ক পথ ছিল। একটি রাজপুতানার আজমির হয়ে, অপরটি মধ্য ভারতের

বুরহানপুর হয়ে। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম তটের মধ্যে যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ ছিল গুজরাটের সুরাট থেকে ঔরঙ্গাবাদ, গোলকোণ্ডা হয়ে বঙ্গোপসাগরের তীরে মসুলিপটনম পর্যন্ত।

মধ্য যুগে মানুষ কেমন ভাবে নানা তাগিদে দূরের পথে পাড়ি দিত তার এক চমৎকার উদাহরণ চিশতি সুফি সাধক গেসু দরাজের জীবনী। শৈশবে আরও অনেকের মত তিনিও দিল্লি থেকে চলে যান মহম্মদ বিন তুঘলকের নতুন রাজধানী দৌলতাবাদে। সাত বছর পরে ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লিতে ফিরে আসেন ও সেখানে তেষট্টি বছর ছিলেন। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লঙ দিল্লি আক্রমণ করলে তিনি আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান।

৬.৩ ভারতে বিদেশী বণিকদের আগমন

ইউরোপ থেকে জলপথে ভারতে আসার জন্য প্রথম দিকে পোর্তুগিজরাই উৎসাহ দেখিয়েছিল। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলার বাণিজ্যকে দখল করা। ইউরোপে ভারতের মশলা, বিশেষ করে গোলমরিচের চাহিদা ছিল খুব বেশি। পোর্তুগিজরা ভেবেছিল যে ভারত থেকে মশলা কিনে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করতে পারলে অনেক লাভ হবে। এই ভেবে পোর্তুগালের রাজার দূত ভাস্কো দা গামা আফ্রিকার দক্ষিণের উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের দক্ষিণে মালাবারের কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছান। কালিকট বন্দরটি ছিল আরব সাগরের তীরে। এর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বন্দরগুলোর খুব ভালো যোগাযোগ ছিল। ফলে নানা দেশের বণিকরাই এখানে আসত বাণিজ্যের টানে।

ভাস্কো দা গামা-র পরে পোর্তুগিজ নৌ-সেনাপতি ডিউক অফ আলবুকার্ক ভারতে আসেন। তিনি আরব সাগরের বাণিজ্যে আরবদের হঠিয়ে নিজেদের আধিপত্য জমাতে চান। তার হাত ধরেই গোয়ায় পোর্তুগিজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ইউরোপের বণিকরা শুধুমাত্র বাণিজ্যই করত না। তারা সমুদ্রকেও নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা করত। তাদের জাহাজগুলি ছিল উন্নতমানের এবং সেগুলিতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকত। এর জোরে তারা আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। গভীর সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের ওপর নানারকম বিধি-নিষেধ চালু করার চেষ্টা করেও পোর্তুগিজরা অবশ্য বেশিদূর সফল হয়নি। এশিয়ার বণিকরা নিজেদের মধ্যে যে বাণিজ্য করত তা চলতেই লাগল। পোর্তুগিজরাই বরং কালে-কালে সেই ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে দিল।

টুকরো কথা

নতুন দেশের খোঁজে ইউরোপের মানুষরা

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইউরোপীয়রা সামুদ্রিক অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিল। তারা চাইছিল ইউরোপের বাইরে যে মহাদেশগুলো আছে সেখানে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনসম্পদ আয় করতে। এই ভাবে তারা পৌঁছায় আফ্রিকা, এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে। এই সব অভিযান হতো পালতোলা জাহাজে চেপে। উৎসাহী অভিযানকারীরা ইউরোপের নানা দেশের রাজা বা অভিজাতদের সমর্থনে অভিযান শুরু করত। প্রথম দিকে স্পেন এবং পোর্তুগাল দেশের অধিবাসীরা এই সব অভিযানে ছিল খুবই সক্রিয়। তারপর ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের বণিক ও শাসকরা এই ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

টুকরো কথা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

১৬০০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে গড়ে উঠেছিল ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে আমস্টারডামে তৈরি হয় হয় ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে তৈরি হয় ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

টুকরো কথা

বাংলায় বাণিজ্য কুঠি

*বাংলায় ব্যান্ডেলে পোর্তুগিজরা তাঁদের ঘাঁটি তৈরি করেছিল। **চুঁচুড়ায়** ডাচরা, **চন্দননগরে** ফরাসিরা, **শ্রীরামপুরে** দিনেমাররা ও **কলকাতায়** ইংরেজরা তাদের কুঠি নির্মাণ করেছিল।*

মানচিত্র ৬.২ : ভাস্কো দা গামা-র ভারত অভিযান

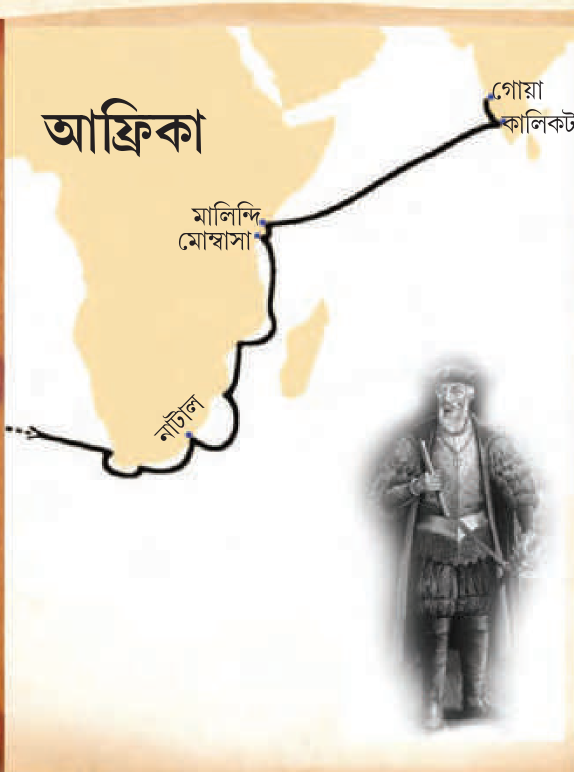

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে ইউরোপে অনেকগুলো বাণিজ্যিক কোম্পানির পত্তন ঘটে। এর মধ্যে ইংরেজ, ডাচ বা ওলন্দাজ, ফরাসি, দিনেমার প্রমুখ বণিকরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসেছিল মুঘল আমলে। ভারতে বিদেশী বণিকদের মধ্যে ওলন্দাজরা পশ্চিম ভারতে সুরাট ও দাক্ষিণাত্যে মসুলিপটনম বন্দর এলাকায় জমিয়ে বসেছিল। মসুলিপটনমের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়েছিল কারণ দক্ষিণ ভারতের ছিট কাপড়ের খুব চাহিদা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে। অন্যদিকে সুরাট ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব সাগরের প্রধান বন্দর। কিছুকাল পরে ডাচরা বাংলাদেশেও চলে আসে।

ইংরেজ বণিকরা প্রথমে মসুলিপটনম ও পরে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের (শাসনকাল ১৬০৩-'২৫ খ্রিঃ) দূত টমাস রো মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজসভায় এসেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় আগ্রা, পাটনা ও বুরহানপুরে ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয়েছিল। মুঘল বাদশাহ

শাহজাহান দাস ব্যবসা করার অপরাধে পোর্তুগিজদের হুগলি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন (১৬৩২ খ্রিঃ)। এর ফলে ওলন্দাজ,ইংরেজ ও ফরাসি বণিকরা অবাধে বাংলায় বাণিজ্য করার সুযোগ পেয়ে যায়।

ইউরোপীয় বণিকরা ভারতীয় দালালদের মাধ্যমে কাজ করত। তারা দালালদের দাদন (অগ্রিম অর্থ বা কাঁচামাল) দিয়ে দিত, যা দিয়ে ভারতীয় কারিগররা ইউরোপীয় বণিকদের চাহিদা মতো জিনিস বানিয়ে দিত। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর যাতায়াতের ফলে বাংলাদেশের চাষিরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধান ছেড়ে আফিম ও রেশম চাষ করতে শুরু করে। এইভাবে বাজারে ফসল বেচে লাভ করার জন্য যে চাষ করা হতো তাকে বলে বাণিজ্যিক চাষ।

রেখচিত্র ৬.১ : ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য

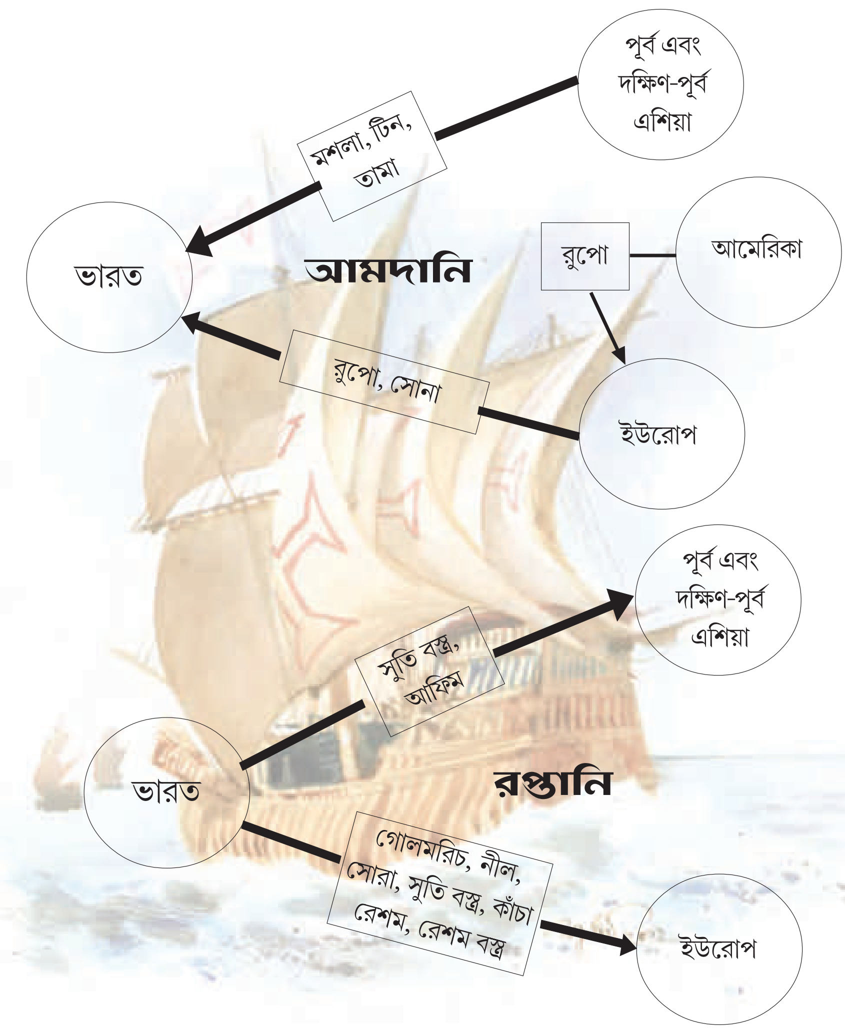

টুকরো কথা

ওলন্দাজ ও দিনেমার

নেদারল্যান্ডস দেশের লোকেদের বলা হয় ডাচ। এরা বাংলা ভাষায় ওলন্দাজ নামেও পরিচিত। ওলন্দাজ নামটি এসেছে পোর্তুগিজ শব্দ হলান্দেজ থেকে। নেদারল্যান্ডস দেশটি হল্যান্ড নামেও পরিচিত। দিনেমার বলতে ডেনমার্কের লোকেদের বোঝানো হয়।

ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলি আস্তে আস্তে নানা ঘাঁটি বানাতে শুরু করে। কোম্পানির কুঠিতে ইউরোপীয় বণিকরা নিজেদের মতো করে বাড়িঘর করত। কুঠিগুলো তারা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দুর্গের মতো সুরক্ষিত করে রাখত। এখানে তাদের বাসগৃহ ও মালের গুদাম থাকত। নিজেদের জাহাজে করে তারা ইউরোপে মাল পাঠাত। ভারতীয় জাহাজের তুলনায় ইউরোপীয়দের জাহাজ আকারে বড়ো হতো এবং সেগুলি গভীর সমুদ্রে নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিল।

এইভাবে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের ভারতে গুজরাট, উত্তর ও দক্ষিণ করমণ্ডল এবং বাংলা হয়ে উঠেছিল ইউরোপীয় বণিকদের প্রধান অঞ্চল। এই চারটি অঞ্চলে যথাক্রমে সুরাট, মসুলিপটনম, পুলিকট এবং হুগলি ছিল ইউরোপীয়দের প্রধান বাণিজ্যঘাঁটি। এইসব অঞ্চলের কারিগররা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত সেখানকার গ্রামগুলিতে। করমণ্ডলের গ্রামগুলোতে সুতো-কাটুনি, তাঁতি, কাপড় ধোলাই এবং রং করার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল চাষিদের থেকে অনেক বেশি।

মুঘল শাসকরা বাণিজ্য করতে বণিকদের উৎসাহ দিত। মালের ওপর শুল্ক ছাড় দিয়ে, কুঠি বানানোর অনুমতি দিয়ে তারা বণিকদের সুবিধা করে দিত। মুঘল অভিজাতদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি বাণিজ্য করত। তবে এই প্রয়াস ছিল খুবই সীমিত। মুঘল সম্রাটরা, রাজপুত্ররা ও অভিজাতরা নিজেদের প্রয়োজনে ও শখ মেটাতে নিজেদের কারখানায় কারিগরদের দিয়ে নানা ধরনের শৌখিন জিনিস, অস্ত্র, বিলাসদ্রব্য তৈরি করাতো। কিন্তু সেগুলো কখনই বাণিজ্যের স্বার্থে তৈরি হয়নি। তাই ইউরোপে যখন ব্যবসা-বাণিজ্যকে ভিত্তি করে অর্থনীতি এগিয়ে চলল, ভারতে তখনও কৃষিই ছিল অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি।

৬.৩ মানচিত্রটি ভালো করে দেখো। কোন কোন বিদেশি বণিক কোম্পানি কোথায় কোথায় ঘাঁটি তৈরি করেছিল, তার একটা তালিকা তৈরি করো।

মানচিত্র ৬.৩ : খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের ভারতে কয়েকটি বিদেশি ঘাঁটি

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও:

(ক) শাহজাহানাবাদ, তুঘলকাবাদ, কিলা রাই পিথোরা, দৌলতাবাদ।

(খ) তঙ্কা, মোহর, হুন্ডি, জিতল।

(গ) নীল, গোলমরিচ, সুতি বস্ত্র, রুপো।

(ঘ) করওয়ানি, কসবা, বনজারা, মুলতানি।

(ঙ) পাণ্ডুয়া, বুরহানপুর, চট্টগ্রাম, গৌড়।

২। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

'ক' স্তম্ভ	***'খ' স্তম্ভ***
সিরি	ডেনমার্কের অধিবাসী
দিনেমার	শেখ নাসিরউদ্দিন
সরাফ	আলাউদ্দিন খলজি
হৌজ	মুদ্রা বিনিময়কারী
চিরাগ-ই দিল্লি	জল সংরক্ষণ

৩। সংক্ষেপে (৩০-৩৫ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) কী কী ভাবে মধ্য যুগের ভারতে শহর গড়ে উঠত?

(খ) কেন সুলতানদের সময়কার পুরোনো দিল্লির আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়েছিল?

(গ) কেন, কোথায় শাহজাহানাবাদ শহরটি গড়ে উঠেছিল?

(ঘ) ইউরোপীয় কোম্পানির কুঠিগুলি কেমন ছিল?

(ঙ) মুঘল শাসকরা কীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন?

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে দিল্লি কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হয়ে উঠেছিল?

(খ) শাহজাহানাবাদের নাগরিক চরিত্র কেমন ছিল?

(গ) দিল্লির সুলতানদের আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার কেন ঘটেছিল?

(ঘ) মধ্য যুগে ভারতে দেশের ভেতরে বাণিজ্যের ধরনগুলি কেমন ছিল তা লেখো।

(ঙ) ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির আমদানি-রপ্তানির রেখচিত্র দেখে ওই যুগের বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা হয়?